অনু হোসেন

পঁচিশ আসে অতুল ঐশ্বর্যে অমিত শক্তিতে

রবীন্দ্রবোধের অনুপম শক্তিকে বিচার করতে হলে তার অতুল ঐশ্বর্যের দিকে বারবার দৃষ্টিবদ্ধ করতে হয়। মহাজগতের বিচিত্র সম্ভারে রবীন্দ্রনাথের অনুগম ও প্রত্যাবর্তন, বিস্তার ও বিবর্তন, রূপ আর রূপান্তর। দারুণ ঔৎসুক্য চেতনায় হৃদয়ের পূর্ণতা দিয়ে তিনি অবিরাম জীবন ও প্রকৃতির সমগ্রতার কাছে অনুগমন করেন। সঞ্চার করেন অভিজ্ঞতা। সময়-সময়ান্তরে তার অভিজ্ঞতা হয় ক্রমশ বিস্তৃত। এই অভিজ্ঞতা বিস্তারের পেছনে রয়েছে অনুগমনের সঙ্গে প্রত্যাবর্তন। আর, এক অভিজ্ঞতা থেকে আরেকটিতে প্রত্যাবর্তনে সৃষ্টি হয় তার বোধের বহুমাত্রিকতা। যে-বিশ্বাসবিন্দু থেকে তিনি যাত্রা করেন সে-বিশ্বাসের ভূমি এতই বিস্তৃত ও প্রসারিত হয় যে তাকে ফিরিয়ে আনা কবির পক্ষে দুঃসাধ্য। তার চেতনা-স্তর গড়ে উঠেছে অনুভবের ‘রূপ’ নির্ণয় ও ‘রূপান্তরের’ মধ্য দিয়ে। নিজেকে পৌনঃপুনিকভাবে রূপান্তর করে এগিয়েছেন তিনি। এক জীবন থেকে আরেক জীবনে। এক অভিজ্ঞতা থেকে আরেক অভিজ্ঞতায়। পরম ব্যাপ্তি ও বিস্তারের ভেতর তার চেতনালোক পরিণত হয়েছে। বিরাম নেই তার জীবন চলার পথে। উনিশ আর বিশ শতকের দায়কে আয়ত্ত করে তিনি শিল্পবোধে প্রবেশ করেন। লেখেন ষাট বছরের অধিক। কোথাও হোঁচট খেয়ে কখনও থেমে থাকলেন না। কবিতা-কথাশিল্প-নাট্য-অনুবাদ-চিত্রকলা সর্বত্রই তার পথচারিতার পদচিহ্ন প্রবল প্রতাপে লেগে আছে। অজানা ও অলক্ষ্যকে করায়ত্ত করার তাগিদে এগিয়ে চলেন তিনি নতুন নতুন সময়বিন্যাসের দিকে।

রবীন্দ্রনাথের চিন্তার পরিধি ও বিস্তার ছিল সার্বভৌম। এই সার্বভৌম ব্যাপ্তির অন্তর্গত শক্তি হল তার কবিত্বপ্রাণ। নিরঙ্কুশ অনুভবের সংযোগ ভিন্ন তার এই কবিত্বপ্রাণের উপলব্ধি করা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। তার কবিত্বপ্রাণ পূর্ণতা পেয়েছে সৌন্দর্যবোধে। আবার কেবল সৌন্দর্যবোধের শক্তি নিয়ে তিনি পারেননি নিরত থাকতে। তাকে একইসঙ্গে বহন করতে হয়েছে সময়ের সামাজিক দায়। রবীন্দ্র-কবির ভেতর তাই বেড়ে ওঠে আরেক সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কারক-রবীন্দ্রনাথ। ‘সংস্কারক-রবীন্দ্রনাথ’ হয়েছেন সাম্রাজ্যবাদের দুর্দান্ত শত্রু ও বাঙালি স্বপ্নবিস্তারের পরাক্রম সৈনিক। রবীন্দ্রনাথের এই সমাজের দায়টি উল্লেখযোগ্যভাবে গড়ে উঠেছে উনিশ শতকের শেষপাদে। উনিশ শতকের অন্য মনীষীদের মতো তিনি এগিয়েছেন সমাজসংস্কারকের পথে। পাঠ করেছেন সমকালের চিন্তা ও দর্শন। প্রভাবিত হয়েছেন ইংরেজি-ফরাসি যুক্তিবাদ ও উপযোগবাদে। সে-সময়ের বিশেষ লক্ষ্য ছিল সামাজিক উন্নয়ন ও লোকশিক্ষা। এ সম্পর্কে ‘মানবসত্য’ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেন, ‘আমার জন্ম যে পরিবারে সে পরিবারের ধর্মসাধন একটি বিশেষ ভাবের। উপনিষদ এবং পিতৃদেবের অভিজ্ঞতা, রামমোহন এবং আর-আর সাধকদের সাধনাই আমাদের পারিবারিক সাধনা। আমি পিতার কনিষ্ঠ পুত্র। জাতকর্ম থেকে আরম্ভ করে আমার সব সংস্কারই বৈদিক মন্ত্র দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়েছিল, অবশ্য ব্রাহ্মমতের সঙ্গে মিলিয়ে। আমি ইস্কুল-পালানো ছেলে। যেখানেই গণ্ডি দেওয়া হয়েছে সেখানেই আমি বনিবনা করতে পারিনি কখনও। যে অভ্যাস বাইরে থেকে চাপানো তা আমি গ্রহণ করতে অক্ষম। কিন্তু পিতৃদেব সেজন্য কখনও ভর্ৎসনা করতেন না। তিনি নিজেই স্বাধীনতা অবলম্বন করে পৈতামহিক সংস্কার ত্যাগ করেছিলেন। গভীরতর জীবন তত্ত্ব সম্বন্ধে চিন্তা করার স্বাধীনতা আমারও ছিল। এ কথা স্বীকার করতেই হবে, আমার এই স্বাতন্ত্র্যের জন্য কখনও কখনও তিনি বেদনা পেয়েছেন। কিছু বলেননি।’

ঔপনিষদিক ঐতিহ্য নিয়ে রবীন্দ্রনাথকে বেড়ে উঠতে হলেও কোনও সংস্কারের গণ্ডি তাকে বন্দি করে রাখতে পারেনি কখনও। তিনি বর্ধিত হয়েছেন গণ্ডির অচলায়তন দীর্ণ করে। তার ব্যাপ্তির প্রভাব এত তীব্র ছিল যে সমকালে তাকে অতিক্রম করার ব্যাপারটি হয়ে পড়েছে নিতান্ত দুঃসাধ্য দুর্মর। ‘প্রধানত তিরিশের কবি ও রবীন্দ্রনাথ’ প্রবন্ধে রামেন্দ্রকুমার আচার্য চৌধুরীর বিচারে জানতে পারি, ‘গৌণ কবিদের কথা বাদ দিই, তিরিশের প্রধান কবিরা প্রায় প্রত্যেকেই রবীন্দ্রসাহিত্যভাণ্ডার লুট করেছেন দু হাতে। প্রতিক্রিয়া এবং আত্মসমর্পণ এই দুয়ের সংঘর্ষের মধ্য দিয়েই তারা অগ্রসর হয়েছেন। আর তাই আমরা দেখতে পাই অজস্র চিঠিপত্র ও নানা প্রবন্ধে অকুণ্ঠ ভক্তিনিবেদন।’ রবীন্দ্রবোধের অর্ধেকটা কেটেছে উনিশ শতকের শেষপাদে আবর্তিত হয়ে। কাজেই এই কবির পক্ষে সে-সময়ের রীতিবাহিত ঐতিহ্য রক্ষা করা ছিল অকাট্য ও অনিবারণীয়। তবু কবি প্রতিভাশক্তি দিয়ে নতুন সৃষ্টিসাধনে অতিক্রম করেন সকল প্রথাবদ্ধতার প্রাচীর। সমকালে বাঙালির জীবনবোধের অন্যতম বিস্ময় ছিল একটি নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সারা জীবন তিনি পরাধীন জাতির যে দুঃসহতা অনুভব করেন তার প্রতি ছিল তার তীব্র বেদনাবোধ। প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরে রবীন্দ্রচিন্তার বিচ্ছুরণে বেঁচেছিল অগণিত মানবের বিশ্বাসবোধ। এই কবিকে ভাঙিয়েই তখন অন্যরা আলোহাওয়ায় বেড়ে-ওঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন। তিনি তার চারপাশের অনেকের চিন্তার ছিলেন উৎসারকবিন্দু।

রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ছিল অন্তরঙ্গ আবেগের মহিমান্বিত প্রকাশ। তার বিশ্ববিমোহী বোধ ছিল প্রবল। কোনও আপাত দুঃখবোধ তাকে কোনওভাবে তাড়িত করেনি কখনও। মহাকালের মাপে সবকিছুকে বিচার করতে অভ্যস্ত ছিলেন তিনি। তাই সমসাময়িকতার খোঁড়লে আটকে থাকেননি তিনি। সমসাময়িকতার মধ্য থেকে বিদীর্ণ হয়ে তিনি মহাজাগতিকতাকে বিচার

করেছেন, দেখেছেন সবকিছুকে মহাসময়বন্ধনের আয়তনে। ভবতোষ দত্তের ভাষায় ('রবীন্দ্রকাব্য-পাঠ'), 'রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনে একটি আশ্চর্য বৈশিষ্ট্য এই যে কোনও আপাতবিরোধকে তিনি বিরোধ বলে ভাবতে পারেননি। বাস্তব এবং আদর্শ যেমন তার কাছে বিরোধী নয়, জীবন ও মৃত্যুও তার কাছে বিরোধী কিছু নয়। তিনি সব কিছুকেই এক মহাসমন্বয়ের মধ্যে নিয়ে গিয়েছেন।' পৃথিবীর প্রতি ছিল রবীন্দ্রনাথের অনায়াস মুগ্ধতা। সৌন্দর্যের প্রতি ছিল অপরিসীম অনুরাগ। প্রেমের প্রতি ছিল চিরন্তন আসক্তি। তাই একটি শাশ্বতবোধের মধ্য দিয়ে তিনি বেড়ে উঠতে চেয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যে ফিরিয়ে আনলেন রূপ ও রুচির দিগন্ত সৌন্দর্য ও আনন্দের পরম পরাকাষ্ঠা। রূপের প্রসঙ্গে বলা যায় তার সাহিত্যবৈভবে সৃষ্টি হল অতুল বিন্যাস ও তার বিকাশ আর ব্যাপ্তি। রবীন্দ্রনাথের অনন্যসাধারণ প্রকাশক্ষমতার বলেই বাংলা ভাষা প্রাণ পেয়েছে আপন সরোবরে। নিজের ঘরের ভাষাকে তিনি তার বিশ্বাস ও ভাবের অনুগত করতে পেরেছেন। তার অনুভূতি ছিল একান্তই মৌলিক, আর অনুভূতি যেখানে মৌলিক সেখানে প্রকাশরীতির ধারাটি নিজস্ব হতে বাধ্য, রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে এ ব্যাপারটি পূর্ণতায় সক্রিয়। তার স্বভাব ছিল শান্ত সৌম প্রশান্তির প্রবলতায় পরিব্যাপ্ত। তাই ইউরোপ ভ্রমণ করেও ওই অঞ্চলের জীবনে সংঘটিত উদ্বেলতা তাকে কোনওভাবে পেয়ে বসেনি। তিনি অগ্রসর হয়েছেন নিজের চিন্তার পথে, অন্তর্গত ভাবনার অলিতেগলিতে পরম দর্শনে। ইউরোপের উদ্বেলতায় নিমজ্জিত হয়ে তিনি প্রশান্তিজনিত আত্মার সংযম হারাননি কখনও; ভাবের অতিচার, অসারে পতিত হয়ে পড়েননি। সমগ্র মানব অস্তিত্ব নিয়ে তার কারবার। সমগ্র অস্তিত্বের প্রশ্নে সাময়িক কলুষতা ও নীচতা তার কাছে গুরুত্বহীন। মানবীয় আশাবাদের লক্ষ্যে তার অগ্রগমন। এই অগ্রগমনের ঋণ অপরিশোধ্য। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বলেন, 'রবীন্দ্রনাথকে ধন্যবাদ, তারই কৃপায় আমরা ধনীর দুয়ারে কাঙালিনী মেয়ের মতো দাঁড়িয়ে থাকিনি। যে-সাজ করে আমরা আজ আসতে পারি তা তারই দেওয়া।'

পর্যটক-রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভ্রমণ-অভিজ্ঞতা থেকে জানতে পারি, তিনি ইউরোপ ভ্রমণ করলেও ইউরোপীয় বিমল মুগ্ধতা তাকে কখনও পেয়ে বসেনি। আবার তিনি নিজেকে সীমাধারী গন্ডলের মধ্যে বেঁধেও রাখেননি। নিজের বিচারশক্তিতে বিশ্বচিন্তার সঙ্গে সমন্বিত করে নিয়েছেন। চিন্তাক্ষেত্রের নেওয়া-দেওয়ার সূত্রকে মিলিয়েছেন বিশ্বক্ষেত্রের সঙ্গে। তিনি বলেন, 'মানুষের মহত্ত্বই হচ্ছে এইখানে; সে আপনার বিশেষত্বকে বিশ্বের সামগ্রী করে তুলতে পারে এবং তাতেই তার সকলের চেয়ে বড়ো আনন্দ। মানুষের আমির সঙ্গে বিশ্বের সঙ্গে মেলবার পথ বড়ো রকম করে আছে বলেই মানুষের দুঃখ এবং তাতেই মানুষের আনন্দ। বিশ্বের সঙ্গে পশুর যোগ নিজের খাওয়া-শোওয়ার সম্বন্ধে; এই প্রয়োজনের তাড়নাতেই পশুকে আপনার বাইরে যেতে হয়, এই দুঃখের ভেতর দিয়েই সে সুখ লাভ করে। মানুষের সঙ্গে পশুর একটা মস্ত প্রভেদ হচ্ছে এই মানুষ যেমন বিশ্বের কাছ থেকে নানা রকম করে নেয় তেমনি মানুষ আপনাকে বিশ্বের কাছে নানা রকম করে দেয়। তার সৌন্দর্যবোধ তার কল্যাণচেষ্টা কেবলই সৃষ্টি করতে চায়; তা না করতে পেলেই সে পঙ্গু হয়ে খর্ব হয়ে যায়। নিতে গেলেও তার নেবার ক্ষেত্র বিশ্ব, দিতে গেলেও তার দেবার ক্ষেত্র বিশ্ব।'

সংকটজীর্ণ, সমস্যাবিপন্ন জীবনকে রবীন্দ্রনাথ কবিতার উপকরণে কখনও স্থান দিতে চাননি। যদিও পরিণত বয়সে তিনি জীবনের অনেক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ঘটনাকে কবিতার বিষয়ীভূত করেছেন তবু তিনি ক্ষুদ্রতার মধ্যে আটকে থাকেননি, তিনি এগিয়েছেন মহাকালকে অবলম্বন করে চিরন্তন আদর্শিক মানবতন্ত্রীবোধে বিকেন্দ্রিত হয়ে তার বিস্তার ঘটেছে প্রতিমুহূর্তে। ভবতোষ দত্ত বলেন, 'তিনি কখনও সাময়িক উপলক্ষে বদ্ধ থাকেননি। সমস্যাকীর্ণ সমাজকে কাব্যে প্রকাশ করে বলার জন্য তার প্রতিভা নিয়োজিত হয়নি। তিনি অনন্ত জীবন, চিরজীবী মানবাত্মার, প্রকৃতির চিরন্তন সৌন্দর্যের কবি। আমাদের পারিপার্শ্বিক বাস্তব প্রকৃতি রবীন্দ্রনাথের চোখে অপরিম্লান সৌন্দর্যরূপে দেখা দিয়েছে। সাধারণের চোখে যা দুঃখকর বীভৎস বা অসুন্দর মনে হতে পারে, কবির চোখে সেটা বৃহৎ বিপুল ও অনন্ত সৌন্দর্যের তুলনায় খণ্ডিত, সীমাবদ্ধ অতএব অসত্য। বিশ্বের সমগ্র অস্তিত্বের সত্যটি অনেক বড়।' নিদারুণ সৌন্দর্যচর্যা ছিল রবীন্দ্রনন্দনবোধের উৎসারক বিন্দু। একমাত্রিক জ্ঞানের দাসত্বে নিপতিত না-হয়ে তিনি ভাবের অপরিমেয় শক্তিতে তার বিশ্বাসমালাকে গ্রন্থিত করেছেন। সেজন্য হৃদয়বিকাশে তার আকর্ষণ ছিল সংযমবিমুখ। কিন্তু আবার কাব্যকলা সৃষ্টিতে এই সংযমবিমুখতা পরিমিতির মাপকাঠিতেই জাত হয়েছে, এ কথা নিঃসন্দেহ। জ্ঞানশাসিত মননের চেয়ে হৃদয়ের অমেয় ভাবনার ব্যঞ্জনাগ্রাহী প্রকাশ যে কী এবং কেমন মাত্রায় গুরুত্ববহ তার প্রকাশ পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্য' প্রবন্ধে, 'যাহা জ্ঞানের কথা তাহা প্রচার হইয়া গেলেই তাহার উদ্দেশ্য সফল হইয়া যায়। মানুষের জ্ঞান সম্বন্ধে নূতন আবিষ্কারের দ্বারা পুরাতন আবিষ্কার আচ্ছন্ন হইয়া যাইতেছে। কাল যাহা পণ্ডিতের অগম্য ছিল আজ তাহা অর্বাচীন বালকের কাছেও নূতন নহে। যে সত্য নূতন বেশে বিপস্নব আনয়ন করে সেই সত্য পুরাতন বেশে বিস্ময়মাত্র উদ্রেক করে না। আজ যে-সকল তত্ত্ব মূঢ়ের নিকটে পরিচিত কোনওকালে যে তাহা পণ্ডিতের নিকটেও বিস্তর বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিল, ইহাই লোকের কাছে আশ্চর্য বলিয়া মনে হয়। হৃদয়ভাবের কথা প্রসারের দ্বারা পুরাতন হয় না। জ্ঞানের কথা একবার জানিলে আর জানিতে হয় না। আগুন গরম, সূর্য গোল, জল তরল, ইহা একবার জানিলেই চুকিয়া যায়; দ্বিতীয়বার কেহ যদি তাহা আমাদের নূতন শিক্ষার মতো জানাইতে আসে তবে ধৈর্য রক্ষা করা কঠিন হয়। কিন্তু ভাবের কথা বারবার অনুভব করিয়া শ্রান্তিবোধ হয় না।'

বর্তমান রচনায় রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ভাবনার অতুল ঐশ্বর্য ও অমিত শক্তিকে বিচারের জন্য কবির বিভিন্ন প্রবন্ধের বিশ্লেষণ কেবল নয়, সমগ্র জীবনে তিনি 'পঁচিশে বৈশাখ'কে কেন্দ্র করে যে-সব কবিতা লিখেছেন তার বিবেচনা থেকেই আমরা রবীন্দ্রবোধের জগৎকে অনুধাবন করতে প্রয়াসী হব।

প্রকৃতির প্রেরণাদায়ী সান্নিধ্যে কবির প্রথম আলোহাওয়ার মুখদর্শন ঘটে। এই পৃথিবীর জলহাওয়া কবিকে মুগ্ধ করেছে। বছর ঘুরে জন্মের মুহূর্ত এলে কবি প্রতি জন্মদিনে লাভ করেন আরও এক নতুনের সন্ধান। কবির ভাষায় ঃ 'চির-নূতনেরে দিল ডাক/পঁচিশে বৈশাখ।' জন্মদিন এলে কবি নিজেকে নতুন করে সাজাতে চান, নতুন প্রেরণায় নিজেকে উন্মোচিত করতে চান। জন্মের আগের সময়টি যেমন মাতৃগর্ভের অন্ধকারে ভ্রূণশিশুর বেড়ে-ওঠা এবং এক সময় পূর্ণতা পেয়ে মানবশিশুতে রূপায়িত হয়ে সে দেখে বিশ্বআলোর রশ্মি; কবি তেমনি পঁচিশে বৈশাখে পুরোনো এক বছরের জীর্ণ অন্ধকার ভেদ করে বেরিয়ে আসতে চান নতুনভাবে বাঁচার আশা 'ব্যক্ত' করে। প্রতি মুহূর্তে জীবনের গতিময়তাকে প্রাণের প্রবাহকে নতুন নতুন উদ্দীপনায় সঞ্চারিত করতে তিনি এগিয়ে আসেন। জন্মদিন এলেই কবির জয়সূচক আনন্দ ঃ 'ব্যক্ত হোক জীবনের জয়,/ব্যক্ত হোক তোমা-মাঝে অনন্তের অক্লান্ত বিস্ময়।' জীবনের ব্যাপক সম্ভাবনার দিগন্তবিস্তারী পরিসরকে উন্মোচন করতে গিয়ে কবির কাছে 'বিস্ময়ে'র অন্ত থাকে না। কিন্তু জীবনের প্রত্যাশার প্রান্তকে আলোকিত করতে কবির আসে না বিন্দুমাত্র ক্লান্তি। তাই তার প্রকাশে আসে 'অক্লান্ত বিস্ময়'।

মানুষের সব কীর্তির মূল্যায়ন সময়ের বরপুত্রের কাছে বন্দি। আজ যা সকলের কাছে গ্রহিষ্ণু ভবিষ্যতের পাঠকের কাছে তার প্রয়োজনের আপেক্ষিকতা কবিকে স্বাভাবিকভাবেই ভাবিয়ে তোলে। জীবনের শেষপ্রান্তে পৌঁছে তিনি সে-সংশয়ের ভার থেকে মুক্ত হতে পারেন না। যা চিরন্তন বলে মানুষ ভাবে প্রকৃতপক্ষে সেই চিরন্তনতার কাছেও তার প্রশ্ন থাকে দ্বিধাময় চিত্তে। কীর্তির মূল্যায়ন যাই হোক পৃথিবীর প্রতি তার ঋণ অন্তহীন ঃ 'কীর্তি যা সে গেঁথেছিল হয় যদি হোক মিছে,/না যদি রয় নাই রহিল নাম/এই মাটিতে রইল তাহার বিস্মিত প্রণাম।'

মানব জীবন কখনোই তার পরিকল্পিত প্রত্যাশার মতো পরিপূর্ণভাবে সফল হয় না। কারণ সেখানে থাকবে বাস্তব জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাত ও দ্বন্দ্ব-নির্দ্বন্দ্বের দোলাচল। একজীবনে প্রত্যাশা বাস্তবায়িত হওয়ার নয়। তবু সৃষ্টিশীল প্রেরণায় উদ্বোধিত মানুষ মৃত্যুর পূর্ব সময়টি পর্যন্ত অসমাপ্ত কাজ সাধনের জন্য ক্রিয়শীল থাকেন। রবীন্দ্রনাথ তার প্রৌঢ় পঁচিশে বৈশাখে সে-কথা ব্যক্ত করেন নানা বিশেষণে ঃ 'এই দুর্গমে, এই বিরোধ-সংক্ষোভের মধ্যে/পঁচিশে বৈশাখের প্রৌঢ় প্রহরে/তোমরা এসেছ আমার কাছে।/জেনেছ কি/আমার প্রকাশে/অনেক আছে অসমাপ্ত,/অনেক ছিন্নবিচ্ছিন্ন,/অনেক উপেক্ষিত?'

জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে সঞ্চিত অভিজ্ঞতার মাত্রাগুলিকে নানাভাবে মানুষ মিলিয়ে নেয় বারেবারে। দেখে কী তার অর্জন, কী তার অপ্রাপ্তিজনিত ব্যর্থতা, তারপর নিজেকে নানা জিজ্ঞাসার মধ্যে সে হিসাবের ফাঁকফোকরগুলিকে পূরণ করে নিতে চায় এই তো মানবজীবনের খতিয়ান। কবি তার সৃষ্টিশীল ভুবনের শুধু নয়, ব্যক্তিজীবনের খতিয়ানও চেতনাপ্রবাহের মধ্য দিয়ে অসংখ্যবার পূরিয়ে নিতে পরম প্রত্যাশী হয়ে ওঠেন। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে এই ব্যাপারটি বিশেষভাবে তার জন্মোৎসবে সংগঠিত হতে দেখা গেছে। কবি পঁচিশে বৈশাখ এলেই তার জীবন-আবির্ভাবের প্রেরণা ও জাগতিক সময়ের নানা উদ্ভাসের কথা স্মরণ করেন বিবিধ চিন্তা ও দার্শনিক ভাবনায় আলোড়িত হয়ে ঃ 'আমার দূরত্ব আমি দেখিলাম তেমনি দুর্গমে/অলক্ষ্য পথের যাত্রী, অজানা তাহার পরিণাম।/আজি এই জন্মদিনে/দূরের পথিক সেই তাহারি শুনিনু পদক্ষেপ/নির্জন সমুদ্রতীর হতে।' জীবনের শুরুতে একদিন তার প্রত্যাশা ছিল অনন্ত অসীমের মধ্যে সৃষ্টিশীলতাকে প্রসারিত করবেন। আজ দীর্ঘ আশি বছরের প্রান্তে এসে সে-সব পরিকল্পনা একটি স্থিত বিন্দুতে এসে ঐশ্বর্যমণ্ডিত হয়েছে। তবু 'অলক্ষ্য পথের' কাছ থেকে বিচ্যুত হওয়ার কথা কবি কোনওভাবেই ভাবতে পারেন না। আবার সীমাবদ্ধ শরীরী সময়ের কথাও কবির যুক্তি ও বিজ্ঞানমনস্ক সত্তা থেকে কোনওভাবে বিচ্ছিন্ন হয় না। তাই একদিন এই শরীরী অবয়বকে ভুবনমোহিনী কোলাহল ছেড়ে যেতে হবে এই কথা মেনে নিতেও তার কোনও দ্বিধা থাকে না। কবি এই শরীরী বিচ্যুতিকে চিত্রকল্পে প্রতিভাসিত করে বলেন 'নির্জন সমুদ্রতীর'। মৃত্যু তাকে কখনও বিমর্ষ-বিপন্ন করতে পারে না। কারণ মৃত্যুকে তিনি দেখেছেন কেবল জীবনপ্রবাহ থেকে শারীরিক বিচ্যুতিরূপে। মৃত্যু জীবনের অংশ। মানব জীবনের প্রবহমানতাকে তিনি বড় করে দেখেছেন। শরীরী বিচ্যুতিও যে মানবজীবনের অচ্ছেদ্য বাঁধনের অংশ, কবির উচ্চারণে সে-নান্দনিক বয়ান ব্যঞ্জনাসহ আভাসিত।

রবীন্দ্রনাথের দৃঢ় বিশ্বাস হল, 'মানুষের দায় মহামানবের দায়, কোথাও তার সীমা নেই।' কৌতূহল ও জানার আগ্রহের প্রান্ত ছিল তার অবারিত-অপরিসীম। জীবনের নানা অন্ধিসন্ধিতে বিচরণ করে মানবের সম্ভাবনা ও বিকাশের কথা ভেবেছেন নানা কৌণিক বিন্দু থেকে। তবে সমগ্র বিবেচনা ও জিজ্ঞাসাকে তিনি দাঁড় করিয়েছেন আত্মবিশ্লেষণের পরিমাপে ঃ 'প্রতিদিন সূর্যোদয়-পানে/আপনারে খুঁজিছে সন্ধান।' নিজের অর্জনের মধ্য দিয়ে মানবের বহুমাত্রিক স্বরূপকে তিনি উন্মোচন করেন। এই প্রকাশটিও সাধিত হয় একটি বিশেষ বিশ্বাসবিন্দু থেকে কবির জন্মদিনে ঃ 'বহু জন্মদিনে গাঁথা আমার জীবনে/দেখিলাম আপনারে বিচিত্র রূপের সমাবেশে।' কবির এই বিশ্বাসবিন্দু অত্যন্ত মানবীয়। মানবের জাগতিক জীবনের বিস্তার ও বিপন্নতার টানাপোড়েনের মধ্যও তিনি জীবনপ্রবাহের নিত্যতাকে স্বীকার করেন, মানবের বহতা জীবনের সার্থকতা দেখেন 'বিচিত্র রূপের সমাবেশে।'

কেবল পৃথিবীতে নিজেকে আবির্ভাবের ক্ষণনির্দিষ্ট জন্মদিন নয়, জীবনের অনেক আনন্দঘন মুহূর্তও কবির জীবনে নবজন্মের প্রেরণা যোগায়। এই প্রেরণা মানবীয় সম্পর্কের। মানবীয় সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছে তার কাব্যবোধে মানবের সঙ্গে মানবের বন্ধুতার বন্ধনের অনাবিল আনন্দে ঃ 'যেখানেই বন্ধু পাই সেখানেই নবজন্ম ঘটে। আনে সে প্রাণের অপূর্বতা।' সরল

বিশেষণে 'অপূর্ব প্রাণ' না-বলে প্রতীপ অলংকারে ব্যঞ্জনাবাহী করে তিনি বলেন মানবীয় সম্পর্ক সাধনের বন্ধুতা জাগায় 'প্রাণের অপূর্বতা' এ যেন মানব প্রাণসঞ্চারণের দুর্লভ প্রকাশ।

সৃষ্টিশীল বৈভবে উচ্চকিত হয়ে, অহমবোধে স্থূল হয়ে কিংবা অবিবেচকের মতো সমাজবিচ্ছিন্ন হয়ে কবি মানবপ্রেমের জয়সূচক আনন্দ থেকে বঞ্চিত হতে চান না। তাই নিজেকে বৃহত্তর জনমানবের অন্যতম বলে ঘোষণা করতে কবির উচ্চারণ হয় নিঃশঙ্ক ঃ 'আমি ব্রাত্য, আমি পথচারী,/অবারিত আতিথ্যের অন্নে পূর্ণ হয়ে ওঠে/বারে বারে নির্বিচারে মোর জন্মদিবসের থালি। কবি নিজেকে ব্রাত্যজন ও পথচারী বলায় সৃষ্টিশীলতার মানবীয় দায় সুস্পষ্ট।

জন্মদিনে মৃত্যুর অনিবার্যতা কবি মেনে নেন। জন্মমৃত্যুশাসিত জীবনের অখ তা ভেদ করে টিকে থাকবে কবির সৃষ্টিশীলতা চিন্তা, অনুভব, উপলব্ধি ও বোধের স্ফূরণ। কিন্তু দেহধারী অস্তিত্ব তো স্বাভাবিক নিয়মেই নিশ্চিহ্ন হবে সময়ের ঘূর্ণাবর্তে। কবির উচ্চারণ ঃ 'তব দেহলিতে শুনি ঘণ্টা বাজে,/ শেষপ্রহরের ঘণ্টা; সেই সঙ্গে ক্লান্ত বক্ষোমাঝে/শুনি বিদায়ের দ্বার খুলিবার শব্দ সে অদূরে/ধ্বনিতেছে সূর্যাস্তের রঙে রাঙা পূরবীর সুরে।' মৃত্যুতেও সৃষ্টিশীল জীবনের প্রকাশ হয় নন্দনবোধে প্রোথিত, তাই কবির কাছে দেহধারী সত্তার বিস্মরণ আসে 'সূর্যাস্ত রঙের' প্রতীক হয়ে যা নিঃশব্দে নয়, আসে 'পূরবীর সুরে' অনুরণিত হয়ে। সময়ের মহাচক্রে পুরোনো বিশ্বাসগুলি যদি আগামী মানবের কাছে জিজ্ঞাসাযুক্ত হয়ে পড়ে তার পরেও কবি পরম বিশ্বাসে নিজের সৃষ্টিশীল কর্ম প্রসঙ্গে অক্ষয়তার কথা উচ্চারণ করেন ঃ ' ভাঙো ভাঙো, উচ্চ করো ভগ্নস্তূপ, জীর্ণতার অন্তরালে জানি মোর আনন্দস্বরূপ/রয়েছে উজ্জ্বল হয়ে।' অস্তিত্বের নানা বিস্তৃতি ও অনুধ্যানে ব্যাপ্ত হয়ে কবি তার প্রতিটি জন্মোৎসবের দিনে সৃষ্টিজাত ঐশ্বর্যের তাড়নায়, দুর্মর শক্তির অমেয়ধারায় নতুন নতুন উদ্দীপনায় জাগ্রত হন।